SABITA

3107-376X (Online)

Journal Homepage: www.sabitajournal.com

Article

# বোম্বের বাবুমশাই: হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়

**জয়দীপ মুখোপাধ্যায়**
চলচ্চিত্র পরিচালক ও তথ্যচিত্র নির্মাতা
Email- jaydip63@gmail.com

**Keywords:**
*Bombay, Movies, Shooting*

ABSTRACT

This article looks into the world of one of the foremost names in Hindi film industry—Hrishikesh Mukherjee. A true Bengali at heart, Mukherjee enriched the genre of movie-making through his simple form of story-telling. Drawing inspiration from everyday lives of the common man, his films resonated with the middle-class who could identify with the characters depicted in his movies. A gentlman who could mingle with any and everybody, Mukherjee, stood out among his contemporaries and continue to inspire film-makers.

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ। ফাগুনের ছোঁয়া পেতে তখনও বাকি আরো দিন সাতেক। বাংলা সন ১৩৭২। দুয়ার আঁটা সেই ঘরে একাকী শঙ্কিত নিশিযাপন মনোবীনার। মৃত্যপথগামী বিমল রায়ের শিয়রে বসা, নিভৃতে! একটু জ্ঞান তখনও কিছুটা ছিল ভারতীয় সিনেমার অন্যতম পথিকৃৎ শ্রী বিমল রায়ের। তাও বোঝা গেল যখন একটুক্ষণ চোখ চাইলেন তিনি। এক-দুটো বিন্দু-জল এলো আধো-আচ্ছন্ন বিমলবাবুর স্বপ্নপ্রসারী চোখে। শীর্ণ তখন ক্লান্ত সে হাত, চেটোয় ধরেছিলেন মনোবীনার। তাঁর স্ত্রীর। তাঁর বড় প্রিয় মণির! বিমলবাবুর নীরবতার ভাষা হয়তো তিনিই বুঝেছিলেন। কান্না-চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন - "নিশ্চিন্ত থাকো। আমি আছি। আমি থাকবো। তোমার ছেড়ে যাওয়া সবাইয়ের খেয়াল রাখবো।"

পশ্চিম বান্দ্রার মাউন্ট মেরী রোডের 'গদিওয়ালা' বাড়িটির আলো-আঁধারি ঢাকা ফুলবাগান-ঘেরা রাতের সিল্যুয়েট-মাখা, আকাশচারি চোখে যতদূর দেখা যায় আলোয় মোড়া টিনসেল টাউন, 'বোম্বে' নামক আমার হৃদয়, আলো-পথ বিস্তৃত মেরিন ড্রাইভ, রানীর কণ্ঠহার আর ঐ অন্ধকারের আরব সাগর তীর, সাগর-সাদা ফেনা তখনও হাল্কা আছরে পড়ছে জুহু সৈকতে....ঘোর তন্দ্রা জাগে, অমানিশার প্রলেপ বোলানো চোখে। বিমল রায় চলে গেলেন বটে সব হারানোর দেশে, কিন্তু সব পাওয়ার দেশে ফেলে গেলেন অনেক কিছু, সেলুলয়েডের রীল-এ মোড়া সিনেমার উপাখ্যানগুলো চিরস্থায়ী। চিরসম্পদ। স্ত্রী মনোবীনা। পুত্র কন্যা পরিবার। আর তার বাইরেও, তাঁর স্নেহের বৃত্তে পালিত এক বৃহত্তর সিনেমা পরিবার। বিমল রায়ের পরম্পরায় আবৃত। সে বড় তৃপ্তিদায়ক। তাঁর দেখানো পথের সিনেমার ধারাপ্রবাহ। সেই সিনেমা-পরিবারেই বেড়ে উঠেছিল হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সিনে-মন।

অদ্ভুত স্বপ্নিল এই সমুদ্র-বন্দর। বোম্বে শহর। মনে হয় যেন ছায়া-ঘেরা মনোরম এক পৃথিবী, মনে হয় যেন কোন সুদূর পারের মেঘ এসে ঢেকে দেয় শহর-আকাশ। রিমঝিম শ্রাবণধারায় স্নাত হচ্ছে সমুদ্রতটের মেরিন ড্রাইভ। এটা আমজনতার মনে উঁকি মারা চেনা বোম্বে। সিনেমায় দেখা। গানে শোনা। "এই আমার হৃদয় - বোম্বে শহর, বিল্ডিং-ট্রাম-মোটর-রেলে মোড়ানো" গুরু দত্তের মাঝ-পঞ্চাশের শহর, "সি,আই,ডি" সিনেমার স্পর্শকাল। রূপোলি পর্দায় এসে গেছে একের পর এক সুন্দর ও সুন্দরীরা। মধুবালার হাল-ফ্যাশান, নার্গিসের হাসির মুক্তধারা, বৈজয়ন্তীমালার নৃত্যশৈলী, সুষমামন্ডিত নূতনের ব্যক্তিত্ব - আর অন্য দিকে রাজ কাপুর, দিলীপ কুমার, দেবানন্দ, গুরু দত্তের পাগল-করা প্রাণের ডালিতে মগ্ন তখন মন্ত্রমুগ্ধ ভারতবাসী। সে সময়ের সেই বোম্বে এই প্রজন্মের কাছে ধরা দিয়েছে সাদা-কালোর সিনে-রীলের প্রেক্ষাপটে। অথচ রং তো ছিল সে শহরে! রঙীন ছিল সিনেমার সেট, রঙীন গাছ-পৃথিবী-প্রান্তর। আরবসাগর তখনও নীল।

সময়টা আরো পিছিয়ে গেলো বছর কুড়ি আগে। ১৯৪০-র দশকের মধ্যভাগ। পশ্চিম মালাডের সোমওয়াড়ি বাজারের ঘিঞ্জি ব্যস্ততা পেরিয়ে এক মাঝারি চওড়া রাস্তার ধারে ধনুকাকৃতি গড়নে বড় বড় করে লেখা 'বোম্বে টকিজ'।স্টুডিও ফ্লোরে ঢোকার জন্য লাল লৌহকপাট ঘরঘরিয়ে টেনে খুললো দারোয়ান। মোটর গাড়িতে বসা বোম্বে টকিজের মালকিন, এক কালের ভারতীয় সিনেমার সুললিতা নায়িকা দেবিকা রানী। মাঝ-শেষের বয়স। সুন্দরী তখনও তিনি, ব্যক্তিত্বে টইটম্বুর। চোখদুটির ওপর কালো আবরণের নর্মা টফি রাউন্ড সানগ্লাস আলতো ছোঁয়ায়ে নামিয়ে নোনামাখা শ্যাওলা-ধরা স্টুডিওর দেওয়ালগুলোর দিকে একবার তাকালেন। বর্ষার ভেজা প্রাঙ্গনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ছোট, বড়, মাঝারি ঘর। আরো কিছুটা এগুলেই পরপর দুটো ফ্লোর।

কর্মহীন বা কর্ম-কমের আলিস্যি। পুরোনো সেই সাম্রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া সীমারেখায়। দেবিকা রানীর প্রিয় বোম্বে টকিজ। পূব থেকে পশ্চিম, দেশ জোড়া নাম তখন সিনেমার এই স্বপ্নপুরীর। প্রথম প্রথমের কথা প্রায়ই এখন মনে হয়। মনে হয় এই তো সেদিনের এতো সব তোড়জোড়!

দেবিকা রানীর অফিসের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। প্রায় ভাঙা হাটের মেলায় কিছু কাছের মানুষের জটলা, কিছু স্তাবক অ-স্তাবক, কিছু নতুন করে পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখা প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় মানুষের উপস্থিতিতে গাড়ি থেকে নামলেন ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি চরিত্র দেবিকা রানী। হালকা রঙের জর্জেটের শাড়ি, সুন্দরপ্রিয়া মুখাবয়বে অবিস্মরণীয় গ্ল্যামার। বয়সী। তবু ব্যক্তিত্বে তিনি তখনও অনন্যা, শিল্পীশ্রেষ্ঠা দেবিকা রানী।

আজ কেন এক যেন অন্য রকম অনুভূতির দেবিকা রানী। তিনি বুঝে যাচ্ছিলেন, দিন তাঁর শেষ। রাজত্বপাট সীমায়িত। অনতিদূরে রমরমিয়ে ষ্টুডিও প্রোডাকশন এর ব্যবসা ফেঁদেছে নবনির্ণিত ফিল্মিস্তান। বিলেতে আর জার্মানিতে থাকার সময়, হিমাংশু  রাই ও দেবিকা রানীর মধ্যে প্রেম ও বৈবাহিক পরিণতি হবার পর থেকে বোম্বেতে ফিরে একটা ষ্টুডিও করার চেষ্টায় রত হলেন।সময়টা ১৯৩২। ওই সময়ে বোম্বেতে সিনেমা প্রযোজনা ও নির্মাণ এক নতুন ফর্মের সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য শুধু নয়, বিনোদন শিল্পে লগ্নির সম্ভাবনার একটি নতুন উদ্যোগ হিসেবেও স্বীকৃতি পাচ্ছিলো ।

ফ্রামজির বেশ কিছু জমি ছিল বোম্বের মালাড ও বোরিভলি অঞ্চলে। হিমাংশু রাই এবং দেবিকা রানী ১৯৩৩ সালে বোম্বে টকিজ নির্মাণের প্রস্তাব নিয়ে ফ্রামজির সাথে যোগাযোগ করেন, তখন তিনি উৎসাহের সাথে সাড়া দেন। ফ্রামজি বুঝেছিলেন, বিদেশ থেকে সিনেমার আধুনিক খুঁটিনাটি শিখে আসা এই সিনেমা যুগল মোদ্দা কোথায় সিনেমাটা বোঝেন।

ভারতের পশ্চিম ভাগের আরব সাগরের নীল জলরাশি আছড়ে পড়ছে পশ্চিম মালাডের চিনচলির কাছে গাঁওথানের তীরভূমিতে। জেলেদের কিছু গ্রাম.. নিঝুম পরিসরে একখণ্ড শান্তির আশ্রয়। গ্রামের বেশিরভাগ জমিই ছিল চাষের জন্য।

প্রতি সোমবার গ্রামের দুর্গা মন্দিরের কাছেই বসত 'সোমওয়াড়ি' বাজার। 'বোম্বে টকিজ' নিরিবিলি সেই জায়গায় সিনেমার কোলাহল ফুটিয়ে তুললো। সালটা ১৯৩৪।

বলিউডে সবাক ছবির জয়যাত্রা গড়েছিল এই বোম্বে টকিজ।কলকাতার নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও ও ম্যাডান থিয়েটার ছাড়াও পুনেতে ভি.শান্তারামের প্রভাত ষ্টুডিও থেকেই হিন্দি ছবি ও আঞ্চলিক ভাষার ছবিগুলো অধিকাংশ তখন তৈরী হত। বোম্বে টকিজ ভারতীয় সিনেমাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিলো। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আধুনিক সরঞ্জাম, আধুনিক প্রযুক্তি তো বটেই, একটা পূর্ণাঙ্গ সামগ্রিক ষ্টুডিও সিস্টেম হিসেবে যা বোঝায়, বোম্বে টকিজ ঠিক তাই। ফ্রামজির ১৮ একরের  জমির বিশাল চৌহদ্দির মধ্যেই গড়ে উঠেছিল সিনে ল্যাবরেটরি, সম্পাদনাগৃহ, অত্যাধুনিক মেক-আপ ও সেট বিভাগ, সর্বোপরি বিদেশী প্রযুক্তির হাত ধরে খুব উচ্চ মানের কারিগর ও শিল্পীদের যুক্ত করা হলো এই স্টুডিওর বিভিন্ন কাজে, যার মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য পরিচালক  ফ্রানজ ওস্টেন।

বোম্বে তখন বাড়ছে। আয়তনে, জন সংখ্যায়, শিল্পে, বাণিজ্যে।ইংরেজ আমল।১৯২১ সালে তৎকালীন ডেভেলপমেন্ট অফিসার সি. এইচ. কাউয়ান একটা সুনির্দিষ্ট ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করেন। বোরিভেলি, কান্দিভেলি, মালাদ, চেম্বুর, গোরেগাঁও এমন সব উপ-শহর এলাকাগুলোকে বোম্বে পুরসভার আওতায় নিয়ে আসা হয়।  বাইরে থেকে আসা অজস্র মানুষের আগমনে বোম্বে শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

সিনেমার অনেক নাম। ছবি, বায়োস্কোপ, ফিল্ম, ফিলিম,বই - এমন সব। যে,  যে নামে আদর করে আর কি! একটা ছিল-রূপোলি পর্দা। ইংরিজিতে 'সিলভার স্ক্রিন'। কেন যে পর্দার রংকে রুপোলি বলা হতো, জানা নেই। খুব সম্ভবত, সেলুলয়েডের এক্সপোসড ফিল্ম, ল্যাবরেটরির গর্ভগৃহে সিলভার নাইট্রেট তরলের পেলব পরশে প্রাণ পেত বলে অথবা, প্রজেক্টরের আলোকিত রশ্মিমালার প্রক্ষেপিত বিচ্ছুরণ যে সাদা পর্দায় রূপকথা আঁকতো, তার রং একটু রূপোলি-রূপোলি লাগতো! সে যাই হোক না কেন, নামটি বেশ। ভালোবাসার ডাক নাম। আমজনতার দরবারে এতো জনপ্রিয় মাধ্যম আগে তো কখনো আসে নি! নির্মিত ছবিগুলো দেখতে মানুষের ঢল নামতো প্রেক্ষাগৃহে ।

সেলুলয়েডে সিনেমা তৈরী বড় প্রাণের শিল্প পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল সিনেমা সৃষ্টিকারীদের কাছে। পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর ছবিগুলোর চাহিদা ছিল বেশি। তাই সেই কার্যক্রমেই তৈরী হতো সিনেমাগুলো, মূলত। ফলে, সিনেমায় বিনিয়োগ বাড়তে লাগলো, বিনিয়োগকারীরা আসতে লাগলো।

বেশ চলছিল। দেবিকা রানী তখন রূপসাগরের রাজকন্যা। একের পর এক হিট ছবি, সিনেমা সম্রাজ্ঞীর নাটকীয় উত্থানের উপাখ্যান। 'অছ্যুৎ কন্যা', 'জীবন নাইয়া', 'সাবিত্রী', 'জওয়ানি কি হাওয়া', 'ইজ্জত' ইত্যাদি একের পর এক সাফল্য। একটা গোটা পরিবারের মতো কাজ হচ্ছিল বোম্বে টকিজ-এ।শশধর মুখার্জী তখন এই স্টুডিওতেই সহকারী শব্দগ্রাহক, ল্যাবরেটরি সহকারী অশোক কুমার গাঙ্গুলি। ফলে, বোম্বের সিনেমা আঙিনায় বাঙালি মনন ও সংস্কৃতি প্রতিভাত হতো বোম্বে টকিজের কর্মধারায়।

কিন্তু সুখ বোধয় সইলো না বোম্বে টকিজের। ১৯৩৬ এর 'জীবন নাইয়া'  শুটিংয়ের ফ্লোর থেকে প্রস্তাবিত নায়ক নাজম-উল হাসানের সাথে দেবিকা রানীর প্রণয়ের প্রেক্ষিতে পালিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে, হিমাংশু রাইয়ের সাথে দেবিকা রানীর সম্পর্কে একটা ফাটল তৈরী হয়। ফলে, বিনিয়োগকারীদের লগ্নি হ্রাস পেলো, বোম্বে টকিজ খুব গুরুতর আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হলো। শশধর মুখার্জীর মধ্যস্থতায় দেবিকা রানী ফিরে এলেও হিমাংশু রাই-এর থেকে নিজের অর্থনৈতিক ব্যক্তিগত শেয়ার বুঝে নিলেন দেবিকা রানী। নাজম-উল হাসানের পরিবর্ত হিসেবে রুপোলি পর্দায় আত্মপ্রকাশ

করলেন অশোক কুমার। এই বোম্বে টকিজ বোম্বে ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক তারকাকে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করেছিল-এঁদের মধ্যে ছিলেন দিলীপ কুমার, লীলা চিটনিস, মধুবালা বা রাজ কাপুরের মতো ব্যক্তিত্বরাও।

মন ভেঙে যাচ্ছিলো সেই সিনেমা সম্রাজ্ঞী দেবিকা রানীর। এরই মধ্যে হিমাংশু রাইয়ের মৃত্যুর পর বোম্বে টকিজ এর উত্থানের পেছনে হিমাংশু রাইয়ের অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটা বুঝতে পারছিলেন তিনি। একা। উপলব্ধি করতে পারছিলেন, বোম্বে টকিজ-এর সুখের সময় প্রায় অতিক্রান্ত। ১৯৪১-এ তিনি অশোক কুমারকে সঙ্গে নিয়ে ছবি করলেন 'অঞ্জান'। ছবিটি চললো বেশ। এই সময় অমিয় চক্রবর্তী 'বসন্ত' ছবিটি পরিচালনার ডাক পেলেন। তারপরের বছর জ্ঞান মুখার্জী বোম্বে টকিজের হয়ে এক জনপ্রিয় ছবি করলেন 'কিসমত'। নায়িকা হিসেবে গুটিয়ে নিলেন নিজেকে দেবিকা। মমতাজ শান্তি ও মধুবালা নিজেদের মেলে ধরলেন সিনেমা জগতে।

জীবনের শেষ ছবির নায়িকা হলেন দেবিকা রানী। 'হামারি বাত'। ১৯৪৩। রাজ কাপুর একটা ছোট রোলে অভিনয় করলেন। কিন্তু আর না। বুঝতে পারছিলেন, বোম্বে টকিজের এখন শেষ সময়। স্টুডিওর মধ্যে বিরুদ্ধ গোষ্ঠী একটু যেন বেশি তৎপর।শশধর মুখার্জী, অমিয় চক্রবর্তী, অশোককুমার প্রমুখরা ওই মালাডেরই আর এক পাশে খুলে বসলেন নতুন এক ষ্টুডিও। ফিল্মিস্তান। বোম্বে টকিজ-এ পড়ে রইলো সুবর্ণ অতীত।

**বিমল রায় ও বম্বে টকিজ**

শেষ লগ্নে বিবাহিত জীবনের মেলবন্ধনের একটা চেষ্টা করলেন দেবিকা রানী। ১৯৪৫। বিখ্যাত রাশিয়ান চিত্রশিল্পী শ্বেতস্লাভ রোয়েরিশকে বিয়ে করলেন। বোম্বে টকিজে তাঁর শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে যান, একজন ফিল্ম ফাইন্যান্সার এবং স্টুডিওর মালিক সিরাজ আলী হাকিমের কাছে। কিন্তু আলি হাকিম ভারত ভাগের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর অংশ বিক্রি করে দেন বোম্বের এক কটন টাইকুনের কাছে। তাঁরা হিতেন চৌধুরী নামে একজন ম্যানেজারকে নিয়োগ করেছিলেন, যিনি অল্প সময়ের জন্য হলেও বোম্বে টকিজকে নতুন জীবন আর শ্বাস দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি কর্মীদের একত্রিত করতে এবং দেবিকা রানীর সময়ের চলে যাওয়া কিছু ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন, যার মধ্যে ছিলেন অশোককুমার এবং সাবক ভাচা। প্রতিষ্ঠানটি আবার ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করে।

১৯৪৯-এ কমল আমরোহীর পরিচালনায় বোম্বে টকিজের ব্যানারে 'মহল' ছবি রিলিজ করলো।দুটি প্রধান চরিত্রে অশোককুমার ও মধুবালা। বোম্বে টকিজ এর কর্ণধারদের কাছে কলকাতার পরিচালক, সম্পাদক ও চিত্রগ্রাহক হিসেবে সর্বগুণসম্পন্ন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সিনেমা ব্যক্তিত্ব হিসেবে কলকাতার নিউ থিয়েটার্সের বিমল রায়ের বোম্বে জুড়ে তখন খুব নামডাক।

১৯৩৫ সালে কলকাতার নিউ থিয়েটার্স-এ সহকারী চিত্রগ্রাহক হিসেবে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' ছবির ইউনিটের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে, ১৯৪৩-এ 'বেঙ্গল ফেমিন' নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরী করার পরেই ১৯৪৪ সালে তৈরী হয় তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি - 'উদয়ের পথে'। নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায়। ছবিটি ব্যবসায়িক সাফল্য পেলেও বিমল রায় এই ছবিতে তাঁর সৃজনশীলতার পরিপূর্ণ এক বাতাবরণ তৈরী করতে পেরেছিলেন। সমকালীন পরিচালকদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বোম্বে টকিজের জন্যে 'মা' ছবি করার ডাক পেলেন বিমল রায়। তাঁর হাত ধরেই বোম্বেতে পা রাখলেন এক ঝাঁক বাঙালি। হৃষিকেশও।

**কলকাতার হৃষিকেশ**

পায়ের পথে সাউথ সাবার্বান হাই স্কুল। চল্লিশের প্রারম্ভিক দশকের হৃষিকেশের কিশোরবেলায় বর্ষা-শীতের আনন্দ মাড়িয়ে ভারতী সিনেমা হলের গলি পেরিয়ে ভবানীপুরের বড় রাস্তা।রিলিজ করা বাংলা বায়োস্কোপের দৌড়ঝাঁপ চলতো ভারতী, ইন্দিরা, পূর্ণ হলগুলোতে। নিউ থিয়েটার্সের ছবি, ভারতলক্ষ্মীর ছবি - আরো কত বাংলা ছায়াছবির ভিড়। মাঝেমধ্যে লাগতো বোম্বের হিন্দি ছবি। হিট ছবি। সুপার হিট ছবি। ফ্লপ ছবি। কিশোর হৃষিকেশ বড় ব্যানার দেখতেন। মাঝে মাঝে যাত্রাপথে টুক করে উঁকি মেরেও হয়তো যেতেন হলের ভেতর লবি স্টিল, ফটোগুলো দেখতে। কিন্তু সিনেমা প্রেমের কথা সে ভাবে কতটা ছিল, সে কথা জানা যায় না। তিনি নিজেও লুকিয়ে রেখেছিলেন ভালোবাসার সেই শৈশব।ঝিনুকের সুপ্ত আবরণে।

বহুদিন বাদে, ১৯৭৩ সালে স্কুলের শতবার্ষিকীতে হৃষিকেশ এসেছিলেন স্মৃতির হাত ধরে, ইস্কুলপ্রাঙ্গনে। ফেলে আসা অতীতকে ছুঁয়েছিলেন বন্ধুদের মাঝে। একটা গ্রুপ ফটো নাকি ছিল বেশ বছর বিশেক। কে বা করা নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেয় নি। খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। মাত্র ২৮ বছর বয়সে বোম্বেতে চির প্রবাসী হয়েও জীবন সায়াহ্নে একাকী মুহূর্তে বোম্বের আকাশপথ পেরিয়ে মন-উদাসী কলকাতার সুখস্মৃতি মর্মে অনুভব করতেন। বন্ধুরা কেউ হঠাৎ করে পৌঁছলে হৃষিকেশ তাঁদের আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি রাখতেন না।

কলেজ জীবনের ১৯৩৯। আশুতোষ কলেজ। কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে হৃষিকেশবাবুর সাথে প্রথম আলাপ হয়েছিল সহপাঠী সমীর চট্টোপাধ্যায়ে।দু-জনের রোল নম্বর ছিল পাশাপাশি-৩৮ আর ৩৯। কলেজ ছাড়ার প্রায় বছর দশেক পরে হৃষিকেশের সাথে আবার দেখা সমীরের।কলকাতাতেই।"ম্যাড ম্যান্স ক্লাব" নাম দিয়ে হৃষিকেশ ওয়াই.এম.সি.এ-তে টেবিল-টেনিস টুর্নামেন্ট খেলতে এসেছেন। তাঁর অনুরোধে সমীরকে প্রায়ই আসতে হতো ওই টুর্নামেন্ট দেখতে।

কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হবার পরে হৃষিকেশ ১৯৪৫-এ প্রথম চাকরি পান ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে। সহকারী ল্যাবরেটরির দায়িত্বে। প্রখ্যাত সম্পাদক হরিদাস মহালনাবিশের অধীনে। বছর দুয়েক ঐখানেই ছিলেন। তারপর যুক্ত হন নিউ থিয়েটার্সে।

শেষ পর্যন্ত বোম্বাইতেই থিতু হলেন। পরিচালক বিমল রায়ের বিখ্যাত দুটি ছবি ‘দো-বিঘা জামিন’ ও ‘দেবদাস’-এর সম্পাদনার কাজ ব্রতী হয়েছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। প্রকৃত অর্থে বোম্বাইয়ের সিনেমায় ‘স্টার মেকার’ বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, তবে তিনিই সেই জায়গাতে অবস্থান করেছেন। তিনি যে ক’টি ছবি বানিয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটি সব ধরনের দর্শককেই খুশী করেছিল। বোম্বাই সিনেমা জগতের তারকা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তিনিই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। প্রতিভাবানদের চিনে নেওয়ার মতো জহুরি ছিলেন তিনি। রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন, অমল পালেকর, জয়া ভাদুড়ির মতো প্রতিভাবানদের তিনিই সিনেমা জগতে এনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। তবে আপাদমস্তক বাঙালি হয়েও বাংলা ভাষায় কোনও সিনেমা তিনি তৈরি করেননি। হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি ‘মুসাফির’। এরপর বলরাজ সাহানী ও লীলা নাইডু অভিনীত ‘অনুরাধা’ দর্শকদের মনে অন্য ধরনের স্বাদ এনে দিয়েছিল। একজন বিবাহিত মহিলাকে কেন্দ্র করে ছবি, যার স্বামী নিজের আদর্শকে সামনে রেখে স্ত্রীকে ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। তখনকার সময়ে ব্যতিক্রমী ছবিটি বোদ্ধামহলে জনপ্রিয়তা পেলেও বক্স অফিস হিট করতে পারেনি। তবে এই ছবিটির জন্য হৃষিকেশ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবেও বিশেষ ক্যাটাগরির চলচ্চিত্র হিসেবে সম্মান অর্জন করে।

সমীর বাবু 'ইন্দো-বার্মা পেট্রোলিয়াম' - এ চাকরি পেলেন। দুজনেই সমসাময়িক রসায়নের ছাত্র। জীবন কিভাবে যেন দুজনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। হৃষিকেশবাবু যখন সিনেমার টেকনিসিয়ান হিসেবে যুক্ত হলেন, কখনো কি ভাবতে পেরেছিলেন, তিনিই একদিন হয়ে উঠবেন এমন এক প্রবাদপ্রতিম সিনেমা ব্যক্তিত্ব! সমীরের সাথে আবার হৃষিকেশের

দেখা হলো বোম্বেতে। হৃষিবাবুর বোম্বে প্রবাসের প্রায় বছর সাতেক বাদে। ১৯৫৭ সালে সমীরবাবু আর হৃষিকেশের আর এক তরুণ দিনের বন্ধু সৌরেন বিশ্বাসকে নিয়ে বোম্বে গিয়েছিলেন। হৃষিকেশের সাথে যোগাযোগ হলো। খুব খুশি হলেন। তখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'আনাড়ি'-র শুটিংয়ে ব্যস্ত। কিন্তু তাঁর মধ্যেও সময় করে দুজনকে নিয়ে চলে গেলেন কমলা মেহে-র পার্কার রেস্টুরেন্টে।

মনে একটা খেদ ছিল হৃষিকেশের। ভেবেছিলেন, বন্ধুদের সাথে মহাবালেশ্বর যাবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকায় সে যাত্রায় আর হলো না। সেটা বারবার জানিয়েছিলেন সমীরকে। ওরা তো অবাক। রাত ১২ টা অবধি চুটিয়ে আড্ডা মেরে পরদিন একটা মানুষ কি করে 'আনাড়ী' ছবির শুটিং-এ যেতে পারেন! কিন্তু হৃষিকেশ তো ক্লান্তিহীন। তার দুদিনের মাথায়, অভিনেতা বিপিন গুপ্তের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার সময় হৃষিকেশ সমীরকে বললেন, " তোকে এখন হোটেলের বদলে 'শ্রী সাউন্ড স্টুডিও'তে নিয়ে যাচ্ছি। আমার বন্ধুদের কথা দিয়েছি তুই ওদের সঙ্গে কয়েক ঘন্টা টেবিল টেনিস খেলবি। আমি তোকে ওদের জিম্মায় রেখে কাজে বেরিয়ে পড়বো। তোর কোনো অসুবিধে হবে না। ওরা তোকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে হোটেলে পৌঁছে দেবে। তারপর তুই অনেক সময় পাবি জিনিসপত্র গুছিয়ে সাড়ে সাতটার ক্যালকাটা মেল ধরবার"।

সেদিনের সেই টেবিল টেনিসের আসরে সমীরবাবু খেলেছিলেন পরিচালক সত্যেন বোস, অভিনেতা শাম্মি কাপুর, সুরকার শৈলেশ ভট্টাচার্য, প্রযোজিকা বন্দনা সেন প্রমুখের সঙ্গে। সেটা একটা অভিজ্ঞতা বটে।

১৯৯৮ সাল। হৃষিকেশ বাবু কারুর মারফত ভুল একটা খবর শুনেছিলেন যে সমীরবাবু আর বেঁচে নেই। উমাদেবীর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে তিনি স্বমহিমায় বেঁচে আছেন। বোম্বের উমা ছিলেন একজন টেবিল টেনিসের ভক্ত, যাঁর সাথে বিয়ে হয় প্রখ্যাত গায়ক মৃণাল চক্রবর্তীর সাথে। উমা আবার হৃষিকেশবাবুর সিনেমার এক বিশেষ ভক্ত, এবং সমীরবাবুরও টেবিল-টেনিস গ্রুপের বন্ধু। সমীরবাবুর মৃত্যুর ভ্রান্ত সংবাদে হৃষিকেশবাবু খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। উমার কাছেই সঠিক সংবাদ পেয়ে উনি আশ্বস্ত হলেন।

সে বছর, এপ্রিল মাসেই সমীরবাবুর সাথে হৃষিকেশ বাবুর আবার দেখা হয়, কলকাতার হাজরা রোডের বাড়িতে। হৃষিকেশবাবু খুব অসুস্থ ছিলেন। সব এপয়েন্টমেন্ট বাতিল করলেও, সমীরবাবুর সাথে দেখা করলেন, আর পুরোনো দিনের স্মৃতির মাঝেই নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। কলকাতা থেকে বোম্বের দূরত্ব কমবেশি প্রায় ২০০০ কিলোমিটার। প্রবাসে চলে গেলেও প্রবাসীরা অতীত দিনের কথা কখনো ভোলেন? হৃষিকেশ ভোলেন নি। বোম্বের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তখন কত না কত বাঙালী। হিন্দি ছবিগুলোতে বাঙালি-ধারা প্রায়শই প্রতিফলিত হতো। বাংলা সাহিত্য নিয়ে, বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে, বাঙালি-বোধ নিয়ে তখন অনেক ছবি হত। বিমল রায় বা গুরু দত্তের মৃত্যুর পরেও হৃষিকেশ মুখার্জি তা কিন্তু বজায় রেখেছিলেন আগাগোড়া। সমীরবাবু তো বন্ধু ছিলেন। ছোটবেলার বন্ধু। কৈশোর যৌবনের বন্ধু। কলেজের বন্ধু। কিন্তু এর বাইরেও ছিল একটা বৃহত্তর জগত। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব জীবন-দোলায় চেনা-অচেনার ভিড়। বোম্বেতে তাঁদের যাতায়াত লেগেই থাকতো। চেনা মানুষদের ঠিকানাও হৃষিকেশ, অচেনাদেরও তাই।

বোম্বেতে কার্টার রোডের সংযোগস্থলে কাছাকাছি হৃষিকেশবাবুর বাড়ি ছিল। বোম্বের বাড়ি। সবার জন্য অবারিত দ্বার। যেন একটা অবিশ্রান্ত হইহই, আড্ডা ও খুশির ফোয়ারা। বাড়িটি দোতলা বাংলো কুটির, বোম্বে নামক সিনেমা-স্বপ্ন ভরা পরবাস ভ্রমণে বাঙালি আর বাংলা মনের অবয়বে তৈরি অ-বাঙ্গালীদের বাসভূমি এবং কর্মভূমিও বটে। ষাট-সত্তর আশির দশকগুলোর সম্বৎসর হঠাৎ ভ্রমনে কেউ আবিষ্কার করতে পারতেন চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা ক্লান্ত ঋত্বিক ঘটককে, গভীর আলোচনায় মগ্ন উৎপল দত্তকে, নতুন গানের সুর রচনায় মগ্ন সলিল চৌধুরীকে, রাহি মাসুম রেজা বা রাজ খোসলার সঙ্গে গম্ভীরভাবে দাবা বোর্ডে চুপচাপ স্বয়ং হৃষিকেশকে, রাজিন্দার সিং বেদীর চোস্ত উর্দু শায়রির উদাত্ব মুখরা, রান্নাঘরে

নিজের হাতে বাঙালি ঘরানার লাড্ডু বানাচ্ছেন স্বয়ং অমল পালেকারের বয়স্কা মা, অথবা গণনাট্য সংঘের 'যশমা উড়ান' থেকে পাঠ করা সংলাপ বলছেন দিনা পাঠক। এছাড়া ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না থেকে জয়া বচ্চন, শর্মিলা ঠাকুর থেকে সারিকা - তামাম বলিউডের নিত্য যাতায়াত হৃষিকেশবাবুর 'অনুপমায়'। বস্তুত অমিতাভ জয়ার প্রাক-ভালোলাগার জন্মলগ্ন থেকে সংগঠিত বিবাহ-পর্ব অবধি নানান সুরধ্বনির সাক্ষী এই 'অনুপমা'। অভিনেতা দিলীপ কুমার যে বাড়িটিতে মজা করে বলতেন 'মিনি বেঙ্গল লজ'। বহিরাগতরাও কেমন করে যেন সেই সাধারণের মেলায় হয়ে উঠতেন পরিবারসম। কারা আসছে-কারা যাচ্ছে হিসাব কে রাখে? অন্যান্য সেলিব্রিটির বাড়ির সদর দরজা পেরোতে যেমন বুক দুর-দুর করে, দারোয়ানের ধমক খাবার ভয় থাকে-এ বাড়িতে নিয়ম একেবারে উল্টো। যারা স্বেচ্ছায় হাজির তারা তো আছেনই, বহাল তবিয়তে খাচ্ছে, যাচ্ছে আর ঘুমিয়ে নিচ্ছেন এক প্রস্থ-হৃষিকেশবাবুর মাথার এন্টেনা মহাব্যস্ত অন্য একটি ভাবনায়। কলকাতার ফিল্ম অথবা সংস্কৃতির দুনিয়ার সঙ্গে যোগ আছে এমন কেউ তাঁকে না জানিয়ে বোম্বের মাটিতে পা দিয়েছে? দিয়ে থাকলে এক্ষুনি পাকড়াও কর তাকে। টেনে নিয়ে এসো। হৃষিকেশ মুখার্জির আস্তানা থাকতে হোটেল কিংবা লজে পড়ে থাকবেন এরা? অসম্ভব।

এমনই একটা ঘটনা ঘটেছিল বিখ্যাত পরিচালক তরুন মজুমদারের সঙ্গেও। ১৯৬৩ সালের কথা। বিখ্যাত প্রযোজক পরিচালক ও ফিল্মব্যক্তিত্ব  ভি.শান্তারামের ডাকে তখন তরুণবাবু তাঁর বহু পরিচিত 'পলাতক' ছবিটি শুরু করবেন। তরুণবাবুর জীবনে সেই প্রথম বোম্বে দর্শন। ওরলি সমুদ্রমুখী এলাকায় একটা বিশাল গেস্ট হাউজের দোতলা ঘরে তখন তরুণবাবুর ঠাঁই হলো। সেদিনটা তরুণবাবুর তখনো মনে ছিল, কোন এক রবিবার। স্টুডিওতে কাজকর্ম নেই। ঘরে বসে ম্যাগাজিন পড়ছিলেন। হঠাৎ দরজায় কলিংবেলের শব্দ। পাল্লা খুলতেই ধুতি-পাঞ্জাবি পড়া দুটি অচেনা বঙ্গসন্তানের সহস্য মুখ। তাকে একটা দায়সারা গোছের নমস্কার জানিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন তাঁরা। মহাব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন, ঘরের প্রতিটি আনাচ-কানাচ, খাটের তলা এমনকি এন্টি-রুমের আলমারির ভেতরটা পর্যন্ত। তরুণবাবু তো হকচকিয়ে গেলেন।  কে তাঁরা,  কেনই বা  এসেছেন? হঠাৎ একজন, তরুণবাবুর সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন 'চলুন'। অন্যজন খাটের তলা থেকে হোল্ডলটা হরহর করে টেনে তরুণ বাবুর দিকে ফিরে বললেন- 'ব্যস- এইতো? আর কিছু নেই তো?' হতভম্ব তরুণবাবুর গলা দিয়ে কোনরকম আওয়াজ বের হচ্ছে না। ইতস্তত করে বললেন 'আপনারা'? কোথা থেকে এসেছেন? একজন বললেন 'আমরা হৃষিদার লোক! হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। তিনি নাকি ছোট্টু, হৃষিকেশবাবুর ভাই। ছোট ভাই। পাশের লোকের পরিচয় দিলেন অজিতদা বলে। হৃষিকেশবাবুর আর্ট ডিরেক্টর। তরুণ বাবুর সংশয় তখনও কাটেনি।

ছোট্টু বললেন 'কোন কথা নয়। এক্ষুনি আপনাকে নিয়ে ওই বাড়িতে যেতে বলেছে। উনি জেনে গেছেন আপনি এখানে। আমাদের ওপর অর্ডার, এক্ষুনি আপনাকে নিয়ে ও বাড়িতে তোলা। চলুন চলুন।'

তখনো পর্যন্ত ঋষিকেশবাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় তো দূরের কথা, তরুনবাবু তাঁকে চোখেই দেখেন নি কখনো কোনদিন।

হৃষিকেশবাবু এইরকমই ছিলেন। তরুণ বাবুর কথায় হৃষিকেশবাবুর বুকের ভেতর আরেকটা ঘর আছে। সেই ঘরে সবাই স্বাগত। এমনিতে তার নিজের সহকর্মীরা তো আছেনই - গুলজার, বীরেন ত্রিপাঠী, বিমল দত্ত, আর ডি বর্মন আরো কত কত অজস্র লোক।

তরুণ বাবু বলেছিলেন অনেক কথাই লেখা যায় তাঁকে নিয়ে, তবু অনেক কথাই বাকি থেকে যায়। যে মানুষ মুসাফির, আনাড়ি, অনুপমা, সত্যকাম, আশীর্বাদ, আনন্দ, অভিমান, গোলমাল, ঝুটি-র মত ছবির পর ছবি করে যেতে পারেন, বোম্বের ওই বেনোজলের স্রোতের বিরুদ্ধে সোজা শিরদারায় দাঁড়িয়ে, তাঁর সব কথা লিখতে গেলে তাঁর মতই অন্তঃকরণ

আর সাহস লাগে। হৃষিকেশবাবু চলে যাবার পর একটা প্রশ্ন চিহ্ন নিঃশব্দে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। সেই ঘরানার কি এখানেই শেষ? বিমল রায়, শচীন দেব বর্মন থেকে শুরু করে সলিল চৌধুরী, শক্তি সামন্ত, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় যে বাংলাদেশের হৃদয়ের এক খন্ড বোম্বের মাটিতে রোপন করে নিয়েছিলেন, অনেক ভালবেসে ফুল ফুটিয়েছিলেন নিজেদের স্বপ্নের গাছে, সেই গাছকি আর বাঁচবে?

১৯৭০ দশকে বোম্বের টার্নার রোড এবং কার্টার রোডের সংযোগস্থলে এই বাড়ি দেখে তখন সবাই বলতো 'সিনেমা পাগল'-দের বাড়ি। এখানে যেন চারিদিকে কেমন বাঙালি-বাঙালি ভাব। হৃষিকেশবাবুর বাড়ি তো! বাগানটি ছিল বেশ। নিজের হাতে ভোরবেলাতে জল দিতেন হৃষিকেশবাবু। এক পাশে ছিল একটা খুব বড় তালগাছ। যেন এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল বোম্বের বুকে একখণ্ড বাংলার বাগানবাড়িটিতে। তালগাছটি হৃষিকেশবাবু কখনোই কাটতে দেননি। বড় প্রিয় ছিল তাঁর। হৃষিকেশবাবুর প্রিয় নেশা ছিল দাবা খেলা। ঘন্টার পর ঘন্টা অক্লান্তভাবে নিজের মনে খেলে যেতে পারতেন দাবা। সঙ্গী থাক বা না থাক। দাবার নেশা তাঁর সেটেও শুটিং-এর অবসরে কাউকে সঙ্গী করে মাঝেমাঝে খেলতেন। যদিও আরেকটা মন পড়ে থাকত পরবর্তী শটগুলোর জন্য।

এই বাড়িতে অবধারিতভাবে আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্য তৈরি থাকতো গোটা দশেক সারমেয় এবং একটি বিড়াল। সারমেয়রা এই বাড়িতে যেন রাজার হালে অধিষ্ঠিত। এমনও দিন গেছে, ধর্মেন্দ্রর মতো মহা তারকারা বসার জায়গা না পেয়ে এদিক-ওদিক বসতে হয়েছিল। কারণ সোফা দখল করেছিল হৃষিকেশবাবুর প্রিয় সারমেয়রা।

বাড়িতে প্রচুর ঘর ছিল। কেউ যদি একটার পর একটা দরজা খুলতেন, চেনা অচেনা পরিচিত অপরিচিতদের ভিড়ে ঠাসা ঘরগুলি যেন এক অবাক পৃথিবী। অনেককেই চেনা যেত না। পরে জানা যেত এদের মধ্যে কেউ একজন নামকরা এক সাইক্লিস্ট যিনি সাইকেল নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কেউ নাকি পন্ডিচেরি আশ্রমের এক সাধু। আরো অদ্ভুত সব অতিথি-যারা কয়েক সপ্তাহ থেকেছেন, আবার চলেও গেছেন। খুব বড় যেন এক আশ্রয়স্থল হৃষিকেশবাবুর অনুপমা বাড়িটি।

এই বাড়িতে যে হেঁশেলটি ছিল, তা সার্বিকভাবে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির রান্নাঘরকে হার মানায়। রান্নাঘরটি সবসময় ব্যস্ত থাকতো। কেউ জানে না লাঞ্চ বা ডিনারে খাবার টেবিলে ঠিক কত লোক খেতে বসবেন। যাঁরা খেতে বসতেন তাঁদের অনেককেই কেউ চেনে না। পথচারী কেউ যদি ভেতরে এসে খেয়ে চলে যেতেন, সেটা লক্ষ্য করার কেউ থাকত না।সব সময় একটা চলমান শুটিং ইউনিটের মত। সারাদিনে এত কিছু ঘটতো - কে যে কার সঙ্গে কি সম্পর্ক, তা জানার ফুরসৎটুকু কেউ পেত না। কে যে কতক্ষণ থাকবেন, তাও কেউ জানতো না। অনুপমা বাড়িটির আতিথেয়তা এরকমই ছিল। হৃষিকেশবাবুর উপস্থিতি যেন সারা ঘর জুড়ে, সারা বাড়ি জুড়ে বট গাছের ছায়ার মতো আলিঙ্গন করে থাকতো।

একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। অভিনেত্রী দীপ্তি নাভাল তখন সদ্য সদ্য বিদেশ থেকে ফিরেছেন। গুলজারের রেফারেন্সে হৃষিকেশবাবুর সঙ্গে পরিচয়। ১৯৮৩ সাল। হৃষিকেশবাবু নতুন ছবি আরম্ভ করলেন 'কিসিসে না কেহেনা'। ডি. এন. মুখার্জির গল্পভিত্তিক শচীন ভৌমিকের চিত্রনাট্যে কমেডি ছবি ছিল এটি। দীপ্তি নাভাল ছিলেন নায়িকা। ফারুক শেখ ছিলেন এবং উৎপল দত্তও ছিলেন। স্ত্রী হারানো কৈলাস পতি তাঁর ছেলে রমেশের বিয়ের জন্য এমন এক পাত্রীর সন্ধানে ছিলেন, যিনি খুব আধুনিকা নন। কৈলাস পতির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, রমেশ-এর ভূমিকায় ফারুক শেখ এবং গ্রামীন চরিত্র রমলার ভূমিকায় দীপ্তি নাভাল। শিক্ষার প্রকৃত রূপ, চরিত্রের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে। শিক্ষা মানেই আধুনিকতা নয়। শিক্ষা নিজের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের এক অনন্য উৎস। এমনই ঘটনার প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছিল 'কিসি সে না কেহেনা'। সেট-এ খুব মজা হয়েছিল। দীপ্তি নাভাল খুব গম্ভীর প্রকৃতির একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

আর সব সময় খুব সিরিয়াস। হৃষিকেশবাবুর সিনেমার শুটিং-এর সময় একটা মজার পরিবেশ সব সময় বিরাজ করতো। সেটে দীপ্তি চুপচাপ থাকতেন। মোটা ফ্রেমের চশমা পড়ে খুব সিরিয়াস ভাবে বই পড়ায় নিমগ্ন থাকতেন। এতটাই সিরিয়াস যে হৃষিকেশবাবুর ছবির সেটের সঙ্গে যা মানানসই নয়। হাসিখুশি হৃষিকেশবাবুর এই পরিবেশ পছন্দ ছিল না। তিনি মজা করে ফারুক শেখকে বলেছিলেন - 'দেখো ফারুক, দীপ্তি কেমন সিরিয়াস লুক দিচ্ছে। ঠিক যেন গুলজারের মত।' অবশেষে হৃষিকেশবাবু ফারুককে দায়িত্ব দিলেন দীপ্তি নাভালকে সহজ করার জন্য। ফারুক শেখ ব্যক্তিগতভাবে খুব উজ্জ্বল একজন চরিত্র ছিলেন। সব সময় খুশি থাকতেন, অন্যকে উৎসাহ দিতেন। মজা করতেন খুব। হৃষিকেশবাবুর কথা অনুযায়ী তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য ফারুক দীপ্তির পেছনে লেগে পড়লেন। একদিন ফারুক শেখ একটা মোটা দর্শনের বই নিয়ে দীপ্তির দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দর্শনের ওপর বই, দীপ্তি এটা পড়ে সমগ্র ব্যাপারটা ফারুক শেখকে যেন বুঝিয়ে দেন। দীপ্তি বুঝলেন, ফারুক সাহেব খুব মজা করছেন। তিনি হেসে ফেললেন। আর তারপর থেকে অবাক কান্ড। কেমন সহজ সরলভাবে দীপ্তি সবার সঙ্গে মিশতে শুরু করলেন। এভাবেই হৃষিকেশবাবু নিজের ছবির শুটিংয়ের সেটে আনন্দের সঙ্গে কাজ করতেন। কিন্তু শট নেওয়ার সময় হৃষিকেশবাবু খুবই সতর্ক থাকতেন। তখন কিন্তু তিনি খুব সিরিয়াস। আর শট নেবার ফাঁকে ফাঁকে দাবা খেলে যেতেন, এক মনে এক কোণে।

একবার এক আউটডোর শুটিংয়ে রেখাকে নিয়েও খুব মজার একটা ঘটনা ঘটেছিল। মহাবালেশ্বরের শুটিং। হৃষিকেশবাবু রেখাকে বলেছিলেন, পাহাড়ের কোল ধরে হেঁটে চলে যেতে। যতদূর যাওয়া যায়। রেখা হাঁটতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু হৃষিকেশবাবুর 'কাট' শব্দটি শুনতে পাননি। রেখা হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গেছিলেন। কখন যে শট শেষ হয়ে গেছে, আর কখন যে প্যাক আপ হয়ে গেছে, তা তিনি টের পান নি। এই ব্যাপারে রেখাজি প্রথমে খুব রেগে গেলেও পরে বেশ মজা পেয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালে তার জীবনের অন্যতম এক সেরা ছবি 'সত্যকাম' - এর শুটিংয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। নারায়ণ সান্যালের  বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে খুব বাস্তবভিত্তিক প্রেক্ষাপটে হৃষিকেশবাবু তাঁর ছবির থিম সাজিয়েছিলেন। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ধর্মেন্দ্র। তিনি তখন সুপারস্টার। বোম্বে ছবির একচ্ছত্র অধিপতি। ধর্মেন্দ্র তাঁর ম্যাচো ফিগারের জন্য খুব জনপ্রিয় ছিলেন যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। 'সত্যকাম'-এ  ধর্মেন্দ্র চরিত্রটি একেবারেই বিপরীতমুখী এবং অন্তর্মুখী এক চরিত্র। হৃষিকেশবাবু সবসময় চেষ্টা করতেন অভিনেতা অভিনেত্রীদের গ্ল্যামারটাকে ভেঙে শুধুমাত্র অভিনয়ের দিকে যাতে তাঁরা মনোনিবেশ করতে পারেন। একদিন শুটিংয়ে ধর্মেন্দ্র এসেছিলেন অন্য কোনও এক ছবির শুটিং সেরে। তাঁর পরনে ছিল ম্যাচো ফিগারের চাপা সাদা চামড়ার আস্তরণ। ধর্মেন্দ্রর এই গ্ল্যামার জগত খুব পরিচিত ছিল বলে তিনি খুব তৃপ্ত বোধ করতেন। সত্যকামের চরিত্রটি ছিল সাধারণ এক যুবক। ধর্মেন্দ্র ভেবেছিলেন তাঁর এই পোশাক দেখে হৃষিকেশবাবু খুব খুশি হবেন। হৃষিকেশবাবু ধর্মেন্দ্রর দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন, একটা সাদা চাদরে শরীর ঢেকে শুয়ে পড়তে। সেদিন নাকি সত্যকামের মৃত্যুর দৃশ্য দৃশ্যায়িত হবে। পরে ধর্মেন্দ্র বলেছিলেন, তাঁর গ্ল্যামার- এর হাওয়া মুহূর্তে যেন মন থেকে ফুস করে বেরিয়ে গেছিল। এই ব্যাপারটাকে নিয়ে পরে শুটিং ফ্লোরেও খুব হাসাহাসি হয়। ধর্মেন্দ্রর বিপরীতে ছিলেন আরেক কিংবদন্তি নায়িকা-শর্মিলা ঠাকুর। সেই সময়ে,  বম্বের ছবিতে নায়িকাদের হেয়ার ড্রেস  চূড়াকৃতি হয়ে থাকাটা খুব স্বাভাবিক মাত্রা পেত। শর্মিলা ওই ভাবেই হেয়ার ড্রেস করেছিলেন। কিন্তু হৃষিকেশবাবুর ওই হেয়ারড্রেস পছন্দ ছিল না। তিনি খুব সাধারণ স্বাভাবিক একটা হেয়ারড্রেস চেয়েছিলেন শর্মিলা ঠাকুরের কাছ থেকে। কিন্তু শর্মিলা জেদ করেছিলেন। ওই চূড়াকৃতি চুলেই তিনি মেকআপ রেখেছিলেন। হৃষিকেশবাবু আর জোর করেননি। ছবি রিলিজের পর 'সত্যকাম' দেখে শর্মিলা ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন কতটা অবাস্তব লেগেছিল তাঁর এই জেদের বশে রাখা মেকআপটি। তাঁর নিজেরই খুব খারাপ লেগেছিল। শর্মিলা বুঝতে পেরেছিলেন, হৃষিকেশবাবুর মতো বড় পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী চরিত্রগুলোকে রূপ দিতে হয়।

এই বোধ  সঞ্চারিত করার দায়িত্বে থাকতেন হৃষিকেশবাবু।

একবার হৃষিকেশ মুখার্জির শুটিং-এর ফ্লোরে বাদামের মতো সাইজের একটা নকল দাঁত কোথায় খুলে যেন হারিয়ে গেছিল। সেটা তো কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে শুটিংয়ে দেরি হয়ে যাচ্ছে। জানা গেল সহকারি টুটু বলে কোন এক ব্যক্তির ওই রকমই একটা নকল দাঁত ছিল। সবাই এই টুটুবাবুকে হাতে-পায়ে ধরাধরি করে বলতে লাগলো দাঁতটি হৃষিকেশবাবুকে ধার দেওয়ার জন্য। টুটুবাবু সবার থেকে পালিয়ে বাঁচে! সবাই টুটুবাবুকে বলতে লাগলো শুটিংয়ে দেরি হলে প্রযোজকবাবু টাকা দেবেন না, আর ছবির শুটিংও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শেষমেষ সেটে সাজানো সোফার তলা থেকে হৃষিকেশবাবুর দাঁতটি উদ্ধার হল। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এরই ফাঁকে ফাঁকে দু-দশ মিনিটের জন্য কুশল বিনিময় করে যাচ্ছেন অমিতাভ ও জয়া, ধর্মেন্দ্র, শর্মিলা, রেখা। কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায় এরা সকলেই এসেছেন প্রাণের টানে। পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদে নয়। জীবনে হৃষিকেশ বাবুর পরিচালিত সর্বমোট ৪২ টি ছবির অধিকাংশ ছবিতেই থাকতো অসাধারণ সব গান। দুঃখের, সুখের, রোমান্টিক, রাগাশ্রয়ী, আনন্দের। কিন্তু হৃষিকেশবাবুর মন পড়ে থাকতো তাঁর পোষা কুকুরদের ওপর। প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তাদের। মোটামুটি এগারোটি কুকুর থাকা সত্ত্বেও, তিনি একবার পেকিনিজ কিনতে চেয়েছিলেন। বাড়ির সবাই তো হই হই করে উঠলো। তিনি এতটাই সারমেয় প্রেমী ছিলেন যে ১৯৬১ সালে নির্মিত তাঁর এক ছবি ছিল 'মেমদিদি'। সংগীতকার সলিল চৌধুরীর কম্পোজিশনে সেই ছবিতে উনি ব্যবহারই করে ফেললেন কুকুরকে নিয়ে একটি গান - 'বেটা আউ আউ আউ... মেরে কান মাত খাও'। গানটি সেই সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

বম্বেতে থাকার সময় প্রথম প্রথম হৃষিকেশবাবুর পাখি পোষারও শখ ছিল। সেই সময় তাঁর রোজগারও ছিল খুব সীমিত। সঞ্চিত অর্থের বেশিরভাগটাই চলে যেত পাখিদের খাবার জোগাতে। পাখিগুলোকে ছোট থেকে বড় করা হতো। তারপর একদিন নীল আকাশে তাদের উড়িয়ে দেওয়া হত। এইখানে হৃষিকেশ বৈচিত্র্যময় এক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। একটি পাখিকে তিনি ডাকতেন 'বুজুবুজু' বলে। কেউ জানে না, ক'দিন ক'রাত তিনি আর ঘুমোতে পারেননি-যেদিন তাঁর প্রিয় বুজুবুজু  নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

যদি একটি কুকুরও সোফার মধ্যে বসে থাকতো, তাকে নামতে বলার কেউ সাহস পেত না। কুকুরগুলোও বুঝতে পারত। কেউ যদি বলতো একটু সরে যেতে, সোফার পাশে একটু বসার জায়গা দিতে, কুকুর গুলো নিজেরাই খুব বিরক্ত হতো। গড়-গড়  করে গর্জে উঠতো। হৃষিকেশবাবুর বাড়ির সবচেয়ে পুরনো কুকুরের নাম ছিল বুধি। এটি ছিল পমেরিয়ান পেকেনিজ। হৃষিকেশবাবুর কাছে এই কুকুরটি প্রথম এসেছিল ১৯৫৭ সালে। যেদিন বুধি প্রথম এই বাড়িতে এসেছিল, সেদিন হৃষিকেশবাবুর হাতে ছিল লাল ফাইলে মোড়া 'আনাড়ি' ছবির চিত্রনাট্য। অনেক বয়সকালে বুধি মারা গেছিল। শেষ বয়সে অসুস্থ হয়েছিল। হৃষিকেশবাবু খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। দিনরাত সেবা করেছিলেন তার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি।

সুইটি বলে তাঁর আরেকটি কুকুর ছিল। আগে নাম ছিল ডিম্পল। সেই কুকুরটিকে একটি বাচ্চা মেয়ে খুব মারছিল। বাচ্চাটির মা এসে তাকে আটকেছিল। হৃষিকেশবাবু, সেই কুকুরটিকেই বাড়িতে নিয়ে এসে নাম পরিবর্তন করে সুইটি রাখলেন। অচিরেই সেই সুইটি হয়ে উঠলো সব কুকুরের সেরা রানী। সোফায় বসে পান চিবুতো। তাকে আবার নড়াচড়া করতে বললে সে কাঁদতে থাকতো। সব সময় মনে করিয়ে দিত সেই হচ্ছে রানী। রাত্রে হৃষিকেশবাবু কাজ থেকে ফিরে আসার পর নিজের হাতে ট্রেতে করে খাবার পরিবেশন করা হতো রানীকে। বাকি সব কুকুর হৃষিকেশবাবুর চারপাশে ঘিরে থাকতো। কিন্তু সঙ্গে পকেটে রাখা চকলেটটি জুটতো শুধু রানীরই ভাগ্যে।

অনেকদিন বাদে একজন হৃষিকেশবাবুর বাড়ির পথ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। ভদ্রলোক প্রখ্যাত গায়ক মান্না দের খুব পরিচিত। হৃষিকেশবাবু তাঁকে ওয়াটারস ক্লাব বাসস্ট্যান্ডের সামনে এসে দাঁড়াতে বললেন। সেখান থেকে গুনে গুনে ২০০ পা। চারতলা বাড়িটির সবার ওপরেও উঠে যেতে বললেন। তবু ভদ্রলোক বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পথ চলতি একজন মানুষকে জিজ্ঞেস করলেন, হৃষিকেশবাবুর বাড়ি কোনটা। যাকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি একজন মারাঠি ভদ্রলোক। তিনি সসম্ভ্রমে দেখিয়ে দিলেন বাড়িটি। ভদ্রলোক কোনরকমে তাঁর বাড়ির সামনে পৌছলেন। চার তলায় উঠেও গেলেন। বাড়ির ঠিক পাশেই দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি। আরব সাগর। মাঝেমধ্যে দু-এক ঝলক গরম হাওয়া গাছপাড়া ফাঁক দিয়ে এসে চোখ মুখ ভিজিয়ে দিচ্ছে। এই পড়ন্ত বিকেলেও বান্দ্রার সমুদ্রে ভিড় অনেকটাই কলকাতার মতো। ভ্যাপসা গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। এখানেই তখন হৃষিকেশ মুখার্জীর বাস। মুখে সৌজন্যের হাসি। ঝোলানো ব্যালকনি, সামনে অপার জলরাশি। ভেতর থেকে ডাক এলো। ঘরে ঢুকে ভদ্রলোকের আরেকবার চমকাবার পালা। এমনিতেই বিশাল ফ্ল্যাটের সুচারু মার্জিত রুচিসম্মত বৈভব গৃহকর্তার প্রতি আলাদা সম্ভ্রম জাগায়। সামনে দাঁড়িয়ে সৌম্য দর্শন এক বৃদ্ধ। ভদ্রলোককে উনি স্বাগত জানিয়ে চেয়ারে বসতে বললেন। আন্তরিকতা এতটাই যে মুহূর্তে যেন মনে হয় যে কোন অপরিচিত তাঁর খুব নিকট আত্মীয়। হৃষিকেশবাবুর খুব আপনার মানুষ। উনি জানালেন, এই বাড়িতে উনি খুব বেশি দিন আগে আসেন নি। উনি থাকতেন পাশের কোন একটা ফ্ল্যাটে। কথায় কথায় উনি বললেন, একদিন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন ওই বাড়িতে। উনি তখন জানতে পেরেছিলেন যে পাশের এই ফ্ল্যাটটা খুব কম দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। মাত্র ১৫ হাজার টাকায়। চার কাঠা জায়গা। তবে সে টাকাও তখন তাঁর কাছে অনেক বেশি ছিল। তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে এত কম দামে সমুদ্রের পাড়ে এমন একটা জায়গা হাতছাড়া করাটা কি খুব সমীচীন হবে? উপস্থিত তখন সকলে মিলে বলল, তারা চাঁদা তুলে দিচ্ছেন, জায়গাটা যেন হৃষিকেশবাবু কিনে নেন। হৃষিকেশবাবু বিশ্বাস করতেন, এক অপরিসীম শক্তি যেন ওনাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সব জায়গাতে সবকিছুতে রয়েছে এক অদৃশ্য হাতের নিয়ন্ত্রণ। কাকতালীয় কোনটাই নয়, রসায়নের ছাত্র ছিলেন তো তিনি। হৃষিকেশবাবুর বাবা ভেবেছিলেন স্কুল মাস্টার গোছের কিছু একটা হবে তাঁর ছেলে। কিন্তু হয়ে গেলেন সিনেমা-নির্মাতা। বম্বেতে আসা ইস্তক ঝোপরপট্টির আড়াইশো টাকার ঘরে তিনি থাকতেন। সে বাড়িতে এক সময়ে লেখক সমরেশ বসু এসেছেন, পরিচালক ঋত্বিক ঘটক এসেছেন। 'অনুপমা' ছবি তখন সদ্য রিলিজ করেছে। রোজ তিনি হলে গিয়ে বসে থাকতেন। একদিন হল মালিকের মা এলেন ছবিটি দেখতে। স্বেতশুভ্র শাড়ীতে যেন সাক্ষাৎ দেবী প্রতিমা। 'অনুপমা' সিনেমাটি দেখে তিনি বেরোলেন। হৃষিকেশবাবু তো তঠস্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছলেন। বোধহয় কাঁদছিলেন। হৃষিকেশবাবু কে জিজ্ঞেস করলেন যে ছবিটা তিনি বানিয়েছেন কিনা! বারবার প্রশংসা করলেন ছবিটির। পরের দিন হলে সেই মালিকের মা হৃষিকেশবাবুকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। প্রচুর খাওয়া দাওয়া করিয়ে তিনি ছাড়লেন হৃষিকেশবাবুকে। তিনি জানতে চাইলেন যে হৃষিকেশবাবু কোথায় থাকেন এখন। শুনলেন ঝোপর পট্টিতে থাকেন। ভদ্র মহিলা খুব দুঃখ পেলেন। পরের দিন হৃষিকেশবাবু আবার যখন সিনেমা হলটিতে গেলেন, হলের মালিক একটা ফ্ল্যাট দেখতে বললেন। হৃষিকেশবাবু বুঝতে পারেননি যে সেই ফ্ল্যাটটি তাঁর জন্যই তাঁকে দেখতে যেতে বলছেন। হল মালিকের সেই মা হৃষিকেশবাবুকে ফ্ল্যাট তো দিলেনই, সঙ্গে একটি গাড়িও কিনে দিলেন। হৃষিকেশবাবুর কাছে সবকিছু স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। তার 'আশীর্বাদ' ছবিটি দেখার পর প্রিমিয়ার পদ্মিনী কোম্পানির মালিক তাঁকে একটি প্রিমিয়ার গাড়ি উপহার দেন।

এক স্বপ্নের যাত্রা শুরু করেছিলেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় বোম্বেতে। দর্শকরা ছিলেন সমঝদার। পরিচালকের গুনাগুন যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করতেন। ভালো লাগলে আনন্দ পেতেন, খারাপ থাকলে তিরস্কার করতেন। হৃষিকেশবাবুর ছবি ভালো না লেগে পারে।

১৯৯৮ সালের ছবি 'ঝুট বোলে কাউয়া কাটে'। অপরাহ্নের আলোয় জীবনের শেষে এই ছবিটি করেই হৃষিকেশবাবু সিনেমা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। বলিউডের নামকরা নায়ক নায়িকা, মন কাড়া গান। তবু ছবিটি চলল না। না বক্স

অফিসে, না দর্শকদের মনে। যে পরিচালক প্রায় ৫ দশক ধরে 'আনন্দ', 'গোলমাল', 'অভিমান', 'মিলি'-র মতো ছবি উপহার দিয়েছেন, তাঁর শেষ ছবির এই মুহূর্তে সংকটময় ক্লাইম্যাক্স কি তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়? নাকি 'ঝুট বোলে কাউয়া কাটে'-র বক্স অফিসে অসাফল্য তখনই বলে দিয়েছিল, শেষ হয়ে গিয়েছে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের যুগ। যুগ পাল্টেছে, জমানা পাল্টেছে। সাদামাটা মধ্যবিত্ত সমাজের টুকরো ছবি বানানোর দিন শেষ। ১৯৫৭-এ মুসাফির দিয়ে পরিচালকের যাত্রা শুরু। আর তারপর এই বদলে যাওয়া ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটের এক দলিল চিত্র তাঁর বর্ণিত ছবির চিত্রমালা।

রঙিন ছবি আসার পর বেশ কয়েক বছর অবিন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল আমাদের জনপ্রিয় ছবির সিনেমাটোগ্রাফি। অন্ধকারকে আবিষ্কার করতে বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের ছবির যে জগতকে আমরা মনে রেখেছি, তাতে অন্ধকারের স্পর্শ নেই বললেই চলে। ১৯৭০ এর হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম সফল ছবি 'আনন্দ' মুক্তি পায়। ছবির নায়ক শরীরে দূরারোগ্য ক্যান্সার বহন করে শেষ কয়েকটা দিন বাঁচবার ফিকির খুঁজছে, এমনভাবে বাঁচতে চাইছে যাতে তার নাম সার্থক হয়। এই মৃত্যুর কাহিনীতে অপরাধ নেই, হিংসা নেই, অশুভের হস্তাক্ষর নেই। 'আনন্দ' ওরফে রাজেশ খান্না যে শুধু লোক দেখলেই দোস্তি পরিচয় দেয় তা নয়, ঘরে বাইরে এমন এক দুনিয়ায় তার যাওয়া আসা চলে, যেখানে তার বন্ধুত্বের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে সবাই প্রস্তুত। এক অর্থে এই ছবি মূলত এইসব মানুষের ছবি, এক শহরের ছবি, যার নাগরিকই তার শুভার্থী। ছবিটি আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসর্গ করা হয়েছে বোম্বে শহরকে আর সেই শহরের এক ছবি করিয়ে বন্ধু রাজ কাপুরকে। বন্ধুত্বের গল্প, শহরের গল্প।

শর্মিলা ঠাকুর বলেছিলেন বয়সে বড় হলেও তিনি হৃষিকেশবাবুকে কখনোই গুরুজন হিসেবে দেখেননি। মাঝেমধ্যেই উনি হৃষিকেশ মুখার্জির বাড়ি যেতেন। আড্ডাও দিতেন। হৃষিকেশবাবু, অশোক কুমার, বিমল রায়, বলরাজ সাহানি – সবাই মিলে বসে গল্পগুজা করতেন। আসলে আড্ডা সেই ধরনের মানুষই জমিয়ে রাখতে পারেন যাদের সব ধরনের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকে। শর্মিলা ঠাকুরের কাছে হৃষিকেশ তাঁর সঙ্গে খুব সহজেই মিশতে পারতেন। কোনরকম বাধাই ছিল না। যে কোনো ধরনের বিষয় তিনি অসম্ভব স্বচ্ছন্দ ছিলেন। এমনকি প্রচুর জোকসও বলতে পারতেন। হৃষিকেশ মুখার্জি চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেছিলেন সম্পাদক হিসেবে। পরিচালক বিমল রায়ের 'মধুমতি' পর্যন্ত সব ছবি তিনি নিজের হাতে যত্ন করে এডিট করেছেন। তাই আপনার থেকেই হৃষিকেশবাবুর ভাবনা চিন্তায় স্বচ্ছতা এসে গিয়েছিল। ক্যামেরায় চোখ রেখে তিনি বুঝতে পারতেন যে কোন দৃশ্যটা রাখা যাবে আর কোনটা না। অন্যেরা যখন ১০-১২টা শট নিতেন, হৃষিকেশ মুখার্জি সেরা কাজটা বার করে নিতেন একটা কি দুটো শটেই। শর্মিলা ঠাকুর সত্যজিৎ বাবুকে যেমন ভয় পেতেন এবং সমীহ করতেন, হৃষিকেশবাবুর ছবিতে কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন যে তাঁকে ভয় পাওয়ার কোন ব্যাপারই নয়। একেবারে সরল সোজা মাটির মানুষ ছিলেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ।

হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মানবতার একজন তীক্ষ পর্যবেক্ষক এবং একজন সামাজিক প্রতিনিধি যিনি মানুষের সাথে আলিঙ্গন করতে পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন উদারতার একজন প্রতীক, রসিক এবং ভালোবাসার একজন মানুষ। শুটিংয়ে দেরি হলে তিনি যেমন অভিনেতাদের বকাবকি করতেন, আবার অনেক সময় নিয়ে এত সুন্দর মেকআপ করার পরে অভিনেতা যখন তাঁর কাছে আসতেন, তখন তাঁর সব রাগ যেন জল হয়ে যেত। অন্যের শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি তিনি সবসময়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন।

ক্রিকেট অন্ত প্রাণ ছিল হৃষিকেশবাবুর। কোনও  খেলা থাকলে টস থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ব্যাটিং অর্ডার ফলো করতেন তিনি। আক্ষেপ করতেন হারানো সুযোগ আম্পায়ারিং ভুল, আম্পায়ারিং-এর মান, অধিনায়কত্ব - এই সবকিছুর। জীবনের শেষ দিকেও যখন তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাসায়ী, তখনো ক্রিকেটের স্কোর জিজ্ঞেস করতে চাইতেন অন্যের কাছে।

চকলেটের প্রতি তার অবিশ্বাস্য মুগ্ধতা ছিল, কিন্তু সেগুলো তিনি নিজে খেতেন না। সেগুলো ফ্রিজে রেখে দিতেন, তারপর এক এক করে বের করে অন্য লোকেদের দিয়ে দিতেন। আর সবচেয়ে প্রিয় ছিল বাঙালি খাবার। প্রতি রাতে বাড়ির লোকেরা একটাই কথা শুনতে পেতেন - "আজ কি রান্না হচ্ছে?"

প্রথম ছবি মুসাফির যথেষ্ট ভালো হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেয়েছিল। কিন্তু বক্স অফিসে চলেনি। অগত্যা রাজ কাপুর আনাড়ি ছবি করতে গিয়ে হৃষিকেশবাবুকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ক্যামেরাম্যান জয়বন্ত পাথারের সঙ্গে রাজ কাপুর আলাপ করিয়ে দেন। পরবর্তীকালে বহু ছবিতে তিনি ক্যামেরাম্যান ছিলেন। হৃষিকেশবাবুর সঙ্গে দিলীপ কুমারেরও একটা গভীর বন্ধন তৈরি হয়েছিল। একবার দিলীপ কুমারের কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন হৃষিকেশবাবু। দিলীপ কুমারকে কেউ একজন খান্ডালায় এক মহিলা সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। দিলীপ কুমার তার কাছে গিয়েওছিলেন। সন্ন্যাসিনী তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কে? তাঁর নাম কি? পরে দিলীপ কুমার হাসতে হাসতে হৃষিকেশবাবুকে বলেছিলেন, পৃথিবীতে বোধহয় ওই একজন মহিলাই আছেন যিনি আমাকে চেনেন না। তাই উনার আশীর্বাদ খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মীনা কুমারিও সব সময় ব্যক্তিগত সমস্যায় ডুবে থাকতেন। হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়-এর সাথে কাজ করতে তিনি খুব পছন্দ করতেন। একবার একটি ছবি শেষ হতে চলেছে। মীনা কুমারি হৃষিকেশবাবুকে বললেন, দাদা- এই শুটিংটা শেষ হয়ে গেলে তিনি তো আবার একা হয়ে যাবেন। আরো ক'দিন শুটিং বাড়িয়ে দিলে হয় না? মীনা কুমারী যে বড় একা! খুব কম বয়সে মারাও গেছিলেন তিনি।

অশোক কুমারও শেষ বয়সে হৃষিকেশবাবুকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, হৃষিকেশবাবু ছাড়া উনাকে কাজ করবার জন্য আর কেউ ডাকে না। বয়স কালে অশোক কুমার যখন পেছনের জানালায় দাঁড়িয়ে দূরে গলফ কোর্সের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, পরিচিত বন্ধুরা কিন্তু কেউ 'হ্যালো' বলতেও আসতেন না । এটা অশোক কুমারকে খুব পীড়া দিয়েছিল। কিন্তু হৃষিকেশবাবু বারবার বিভিন্ন চরিত্রের জন্য অশোক কুমারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। রাজেশ খান্না একবার বলেছিলেন, তাঁর জীবনে প্রথম থেকে ৯৯ তম পরিচালকের নাম হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়।

বলিউডে অমিতাভ বচ্চনেরও গডফাদার ছিলেন! শুনতে অবাক লাগলেও, এটাই সত্যি। বিগ-বি স্বয়ং এ কথা স্বীকার করেছেন। আর সেই গডফাদারের নাম হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। 'আনন্দ' থেকে শুরু করে 'চুপকে চুপকে'— হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের ন'টি ছবিতে অভিনয় করেছেন অমিতাভ। পরিচালকের নবম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে অমিতাভ বলেছিলেন "হৃষিদা ছিলেন আমাদের গডফাদার। যে ধরনের ছবি উনি বানাতেন, তেমন ছবি এখন আর কেউ করেন না। খুব মিস করি সেই সব ছবিগুলো।" হৃষিকেশ-অমিতাভ জুটির একের পর এক হিট ছবি এক সময়ে বলিউডে সাড়া ফেলেছিল। 'মিলি', 'জুরমানা', 'নমক হারাম'-এর মতো ছবিতে একেবারে আটপৌরে ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল বিগ-বি'কে। অনবদ্য গল্প, চিত্রনাট্য আর পরিচালকের হাতযশে এক অন্য অমিতাভ বচ্চনকে পেয়েছিলেন দর্শকরা।

জাতিভেদ প্রথা ও জমিদারির উপর কুঠারাঘাত, সিনেমায় অন্য মোড়কে দলিতদের জীবন কথা, পাশাপাশি এক পিতার হৃদয়ের যন্ত্রণাকে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে তুলে সাদা-কালো পর্দায় ধরেন 'আশীর্বাদ' ছবিতে। ছবিটি 'সুপার-ডুপার হিট' সেই সঙ্গে অশোক কুমারের 'লিপ'-এ 'রেলগাড়ি ছুক্ ছুক্ ছুক' গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ব্যতিক্রমী আরেকটি ছবি 'সত্যকাম'। একটি যুবক যে কিনা স্বাধীনতার পর এক ভিন্ন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হওয়ার পথই পায় না। তাকে হতাশা কুরেকুরে খায়।

জয়া ভাদুড়ী প্রথম হিন্দী ছবিতে সুযোগ পান হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'গুড্ডি' ছবিতে। সিনেমা জগতের প্রতি ছেলেমেয়েদের অবাস্তব ধারণা ও স্বপ্নের জগতের নায়ক-নায়িকাদের প্রতি তাদের অসার আকর্ষণকে নৈপুণ্যের সঙ্গে সেলুলয়েডে হৃষিকেশ অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধুরেন 'গুড্ডি' ছবিতে।

গুলজার লিখেছেন, ‘গুড্ডি’র শুটিং চলছে। সিনও লেখা চলছে। শুটিং চলাকালীন অন্য একটা ছবির খুব বড় একটা সেট পুড়ে যায়। হৃষিকেশ তাঁর ছবির চিত্রনাট্যকার গুলজারকে বলেন, একটা সিন লিখতে, যেখানে এক জন স্টিল ফোটোগ্রাফার ধর্মেন্দ্র-র ছবি তুলতে আসবে আর ধর্মেন্দ্র বলবেন, ‘আমার ছবি তুলে কী হবে, ওই সব কর্মীদের, স্পট বয়দের ছবি তুলুন, যাদের ক্ষতি হল। তাদের ছবি তুলে বলুন, কী অবস্থা এদের। গুলজার বলেছিলেন, ‘হৃষিকেশদা, ভীষণ মেলোড্রামাটিক হয়ে যাবে। হৃষিকেশ এক বকুনি লাগিয়ে বললেন, ‘যা বলছি, তাই কর।’ সিন লেখা হল, শুটিং হল, কিন্তু আমরা বলতেই থাকলাম, এই সিনটা বাদ দিন, ঠিক যাচ্ছে না সিনেমার সঙ্গে। হৃষিকেশদা শুনলেন না। রিলিজের প্রথম শোতে দর্শকদের রেসপন্স দেখে আমরা তো অবাক। যেই ওই সিনটা এল, দর্শক চেঁচিয়ে বাহবা দিল, হাততালিতে ফেটে পড়ল গোটা হল।গুলজার লিখেছেন, ‘গুড্ডি’র শুটিং চলছে। সিনও লেখা চলছে। শুটিং চলাকালীন অন্য একটা ছবির খুব বড় একটা সেট পুড়ে যায়।

হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় এমন একজন পরিচালক যিনি সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের জীবনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেলুলয়েডে তুলে ধরেছেন। তিনি এমন সব অসামান্য কাজ করে গেছেন, যা আবহমান কাল ধরে সমাজে বন্দিত হবে। তাঁর রচিত সংলাপ, চরিত্রের বিন্যাস চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মনের মণিকোঠায় চিরকালের জন্যে জায়গা করে নিয়েছে।

এক অসামান্য মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় তাঁর ছবিতে – মধ্যবিত্ত সমাজের কৌতুকাবিষ্ট সাতকাহন, যা এই মহান চলচ্চিত্র নির্মাতাকে এক অন্য আসনে উপবিষ্ট করেছে। প্রথম যৌবনের স্পর্শ অনুভব করা পাশের বাড়ির তরুণী হোক, বা পারিবারিক কলহ, তাঁর চরিত্ররা সিনেমাপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত।

নরম মনের পৃথিবীতে স্বচ্ছতার পূর্ণতায় ভরা হৃষিকেশের অবাধ যাতায়াত। ছোট ছোট আনন্দ, ছোট-বড় মুহূর্তগুলো কখনই তিনি কোলছাড়া করতে পারতেন না। তাঁর ছবিতে নানাভাবে যেমন এসেছে 'পাশের বাড়িতে দেখা' চরিত্রগুলো, বাঙালী-সত্তার অভিমানী উপলব্ধিগুলো, তেমনই খুব সহজভাবে উপস্থাপিত করেছেন জীবনের নানান স্তরের মূল্যবোধ, তাঁর জীবনবোধের দর্শনও। হাসি-আনন্দভরা এক নবজীবনের কাহিনী হয়ে উঠেছে তাঁর ছবিগুলো, গল্পবিন্যাসে তাঁর ব্যতিক্রমী দক্ষতার গুণে সুগভীর বৃত্তান্তগুলোতে ছন্দের প্রাণে সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ের অন্তঃস্থলের দরজা খুলে দিতে পারতেন তিনি। স্বচ্ছন্দে তাঁর ছবিতে সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপিত হতো - "খুব বড় খুশির অপেক্ষায় আমরা এই ছোট ছোট আনন্দের মুহূর্তগুলো হারিয়ে ফেলি"('বাবুর্চি') অথবা "মানুষ তাদের জীবনের সবচেয়ে ছোট অথচ সবচেয়ে দামি শব্দটি ভুলে গেছে - যার নাম 'ভালোবাসা'" ('বাবুর্চি') অথবা "বন্ধুত্ব ভালো বা মন্দ হয় না - বন্ধু ভালো বা খারাপ হয়" ('মিলি') অথবা "জীবনটা অনেক বড় হওয়ার দরকার, লম্বা নয়" ('আনন্দ') - এমন অজস্র সংলাপে ভরা তাঁর ছবির সাউন্ড-ট্র্যাকে তাঁর জীবনদর্শন ভাগ করে নিতেন তিনি দর্শকদের সাথে। তিনি মনে করতেন যে "খুশি হওয়াটা সহজ, কিন্তু সহজ হওয়াটা কঠিন" (বাবুর্চি')। বম্বে টকিজে এবং তার পরবর্তী পর্য্যায়ে হৃষিকেশ তাই হিন্দি ছবিতে বাঙালি শিকড় গ্রথিত করর প্রয়াসী হলেন, আর সেখানেই বোধহয় হয়ে উঠলেন তাঁর সময়ের সফলতম পরিচালক। তাঁর সব কাল-অতিক্রমী অনুভূতিগুলোর অংশীদার করে রেখে গেলেন উত্তরসূরীদের।

কত তাঁর ছবি, কতই না জীবন্ত সব চরিত্র! 'আনন্দ', 'মিলি' বা 'গুড্ডি' তো বটেই, পার্শ্ব চরিত্রগুলোও, যেমন, 'অভিমান' ছবিতে সব সময়ে বিয়ের স্বপ্ন দেখা নর্তকী চিত্রা (অভিনয়ে বিন্দু), 'গোলমাল' ছবিতে সনাতনী মেজাজী ভবানীশঙ্কর (অভিনয়ে উৎপল দত্ত) যিনি বদলে যাওয়া সময়ে, শেষে কম্প্রোমাইজ করেছিলেন আধুনিকতার সাথে, 'চুপকে চুপকে' ছবিতে মদ্যপ আর কৌতুককর হিন্দি উচ্চারণের ড্রাইভার জেমস ডি'কস্টা (অভিনয়ে কেষ্ট মুখোপাধ্যায়) যিনি গাড়ি খারাপ হলেই বলে ওঠেন "গাড়ি মে লাফড়া হ্যায়" অথবা 'আনন্দ' ছবিতে মেট্রন ডি'সা (অভিনয়ে ললিতা পাওয়ার) যিনি

জীবনের জয়গান গাওয়া প্রোটাগনিস্ট চরিত্র আনন্দের মৃত্যুতে পুত্রসম স্নেহে কান্নায় ভেঙে পড়েন যখন হঠাৎ বেজে ওঠা টেপ রেকর্ডারে আনন্দেরই কণ্ঠে সংলাপে শোনেন - 'জীবন-মৃত্যু সবই উপরওয়ালার হাতে, আমরা সবাই রঙ্গমঞ্চের কাঠ-পুতুল'।

হৃষিকেশের ছবি আসলে গল্পভিত্তিক কোন তথ্যপ্রকাশ নয়, একটা দর্শন, একটা সামগ্রিক কনসেপ্ট। মানবজীবনের অনেক অন্তর্নিহিত ছবির পসরা - যেখানে আশা থাকে, আনন্দ থাকে, মান-অভিমান-দুঃখ থাকে, জীবনবোধের গল্প থাকে, মূল্যবোধ থাকে আর থাকে মানুষের প্রতি গভীর আবেগভরা অকৃত্রিম ভালোবাসা। বিষয় ভাবনায় বৈচিত্র্য, গল্পটিকে সিনেমার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ আর খুব সূক্ষ্ম অনুচ্চ হিউমার তাঁকে এক 'নিজস্বতা' এনে দিয়েছিল। বিনয়ী হৃষিকেশ তবু মাঝে মাঝে বলতেন, চলচ্চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর ঊর্ধসীমা সীমাবদ্ধ। একবার সত্যজিৎ রায়কেও জানিয়েছিলেন সে কথা। হৃষিবাবু বিস্ময় প্রকাশ করতেন যে সত্যজিৎবাবু এত উন্নত ভাবনায় ছবি করতেন কি করে? প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রকার হয়েও সত্যজিৎবাবুর সহকারী হিসেবে কয়েকটি ছবিতে তাঁর কর্মধারার সাথে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছের কথা একবার ব্যক্ত করেছিলেন। উত্তরে সত্যজিৎ হা-হা করে উচ্চৈঃস্বরে শুধুই হেসেছিলেন। সত্যজিৎবাবু নিজেও সম্মান করতেন হৃষিকেশের সিনেমা উপস্থাপনাকে, শ্রদ্ধা করতেন তাঁর সম্পাদনার কুশলতাকে।

আসলে ভালো ছবির মান টেকনোলজির ওপর কিছু নির্ভর করে না। ভারতীয় ছবিতে যতই টেকনোলজি আসুক না কেন হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু ছবি কালজয়ী হয়ে থাকবে। বরং টেকনোলজি যদি এত উন্নত হয়ে থাকে, তবে সেটা যথাযথ প্রয়োগ করাটাই বাঞ্ছনীয়। হৃষিকেশবাবুর প্রিয় ছবি সত্যকামের ছবির প্রিন্ট নষ্ট হয়ে গেছে। আরো বেশ কিছু ছবির প্রিন্ট কোয়ালিটিও তথৈবচ। ভালো করে নেগেটিভ গুলো সংরক্ষণ করা হলে সকলেই দেখতে পারতেন হৃষিকেশবাবুর অনবদ্য সব সৃষ্টিগুলো।

শেষ জীবনে একাকী সন্ধ্যাগুলো কেটে যেতো নির্জনতায়। 'অনুপমা' বাড়িটি তখন শুধুই স্মৃতি। ভারত সরকারের স্বীকৃতি মিলেছে, সমগ্র পরিচালকজীবনের সম্মানস্বরূপ 'দাদা সাহেব ফালকে' পুরস্কারে। কত ছাপার অক্ষরে, কত ভিডিওর ফিতেতে তাঁকে স্পর্শ করা হয়েছে। তবু শেষ শয্যা তো বটে। ২০০৬ সাল। বোম্বেতে দেখা হলো তাঁর শেষ বর্ষার সাথে। এক পুত্র সন্দীপ তখন সদ্য প্রয়াত। সারা জীবন 'জীবন' খোঁজা মানুষটির মৃত্যুকালীন পরবাসে যাওয়ার সময়ে। ডায়ালিসিস চলছে তাঁর। মাঝে মাঝে শিয়রে দেখা মেলে চিত্র সমালোচক আলি পিটার জনের। পুত্র সন্দীপের গচ্ছিত চল্লিশ হাজার টাকা জনকে দিয়ে যেতে চাইছিলেন তিনি। ভালো কাজে দান করার জন্য। জন তাঁর পরিচিত এক নান-এর সন্ধান দেন, যিনি একটি অনাথ আশ্রম চালান। খুব খুশি হয়েছিলেন তিনি। একবার সুনীল দত্ত এলেন। বিমল রায়ের পরিচালিত 'সুজাতা' ছবির কত গাথা-স্মৃতি-কথা রোমন্থন করলেন। যাওয়ার আগে জনকে আরেকবার মনে করিয়েছিলেন নান-এর কথা। "দেরী করো না যেন, সময় কিন্তু খুব বেশি হাতে নেই"-বলেছিলেন হৃষিকেশ। নানকে সময়মতো হজির করাবার আগেই আগস্টের ২৭ তারিখ মৃত্যু হলো ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের এক স্তম্ভ- প্রয়াত হলেন হৃষিকেশ। শেষ বিদায় জানাতে গেলেন অনেকেই। আলি পিটার জন-ও। চোখ পড়লো টেবিলের ওপর । একটা মুখবন্ধ খাম - ওপরে গোটা অক্ষরে হৃষিকেশের হাতে লেখা 'আলি পিটার জন'। কাঁপা হাতে খামটি খুললো জন। ভেতরে রাখা হৃষিকেশের শেষ ইচ্ছেটুকু - নানকে দেবার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা।

আনন্দ' ছবির শেষ দৃশ্যের মতো টেপ রেকর্ডারে যেন বেজে উঠলো - "বাবুমশায়...এত ভালোবাসা ভালো নয়!"